বণিক বার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী
মার্চ ১৮, ২০২০

সংকট কাজে লাগিয়ে সুযোগ সৃষ্টি প্রসঙ্গে

ড. সাজ্জাদ জহির

বহু বছর আগে নাইলস এলড্রিজের লেখা দ্য প্যাটার্নস অব ইভল্যুশন (বিবর্তনের ধরন) বইটি পড়েছিলাম। ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের কিছু পরিবর্ধন সেখানে প্রস্তাবনা আকারে আলোচনা করা হয়েছিল। মুখ্য একটি প্রস্তাবনার সঙ্গে সংকটতত্ত্বের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে, যা চলমান করোনা জীবাণু (ভাইরাস) সংক্রমণকালে খুবই প্রাসঙ্গিক। একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে নাইলস দেখিয়েছিলেন, আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের পর জঙ্গলের একাংশ পুড়ে গেলে সেই এলাকা (শূন্যতা) দখলের (পূরণের) জন্য আশপাশের বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের মাঝে প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং কেবল যোগ্য প্রজাতি সেই এলাকায় বিস্তারলাভ করতে সক্ষম হয়। কভিড-১৯ মহামারী রূপ নেয়ার প্রক্রিয়ায় সমাজ ও অর্থনীতির অনেক অঙ্গনেই সনাতনী ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়েছে এবং একদিকে যেমন জীবাণুবিরোধী লড়াইয়ে প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনায় নতুন উদ্যোগ লক্ষণীয়, তেমনি বহু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী, সংস্থা ও দেশ বিভিন্ন উন্মুক্ত অঙ্গন দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। শুধু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই নয়, কর্মপদ্ধতির পরিবর্তনও লক্ষণীয়। এ নিবন্ধে সেই জাতীয় কিছু প্রবণতার উল্লেখ করে বাংলাদেশে করণীয় সম্পর্কে মত দেয়া হয়েছে।

কিছুদিন আগে দিল্লি পলিসি গ্রুপ (ডিপিজি) প্রকাশিত চায়না মনিটর প্রকাশনায় কভিড-১৯ মোকাবেলায় নিম্নোক্ত তিনটি চীনা কৌশলের উল্লেখ করা হয়, যা বাংলাদেশের জন্যও শিক্ষণীয়।

(১) পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে জনগণের কাছে চাল-সবজি (পিপলস রাইস ব্যাগ অ্যান্ড ভেজিটেবল বাস্কেট) পৌঁছে দেয়া এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মান ও দাম স্থিতিশীল রাখা। এ উদ্যোগের সহজ-সরল যুক্তি হলো, মানুষের হাতের নাগালে পর্যাপ্ত খাদ্য থাকলে তারা সন্ত্রস্ত হবে না এবং মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।

(২) কিছু কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোকেমিক্যাল কোম্পানি, পাওয়ার গ্রিড ও পাওয়ার উৎপাদনকারী কোম্পানি, লোহা ও স্টিল উৎপাদক) এবং বিশেষ বিশেষ সেবা খাত প্রতিষ্ঠানগুলোকে জরুরি ভিত্তিতে উৎপাদন চালুর নির্দেশ দেয়া হয়, যেন কর্মসংস্থান ব্যাহত না হয় এবং বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে চীনের আধিপত্য বজায় থাকে।

(৩) সংকটকে সুযোগে রূপান্তরের সচেতন প্রয়াস শুরু থেকেই লক্ষণীয়। বিশেষত চীনের শিল্প কাঠামো অধুনাকরণ, সরবরাহ ব্যবস্থায় সংস্কার জোরদার, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে শিল্প খাতের পুনর্বিন্যাস, সর্বোপরি, বিগ ডাটা (বিশাল তথ্যভাণ্ডার) ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই বা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স) ব্যাপকতর ব্যবহারের মাধ্যমে মানবশ্রমমুক্ত উৎপাদন খাত ও সেবাশিল্পের বিস্তারে সহায়তা প্রদান। অধিকন্তু সংগনিরোধ (কোয়ারান্টাইন) থাকাকালীন দুঃসহতা

প্রশমন করতে প্লাটফর্ম ইকোনমি, শেয়ারিং ইকোনমি ও ডিজিটাল ইকোনমিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

মহামারী পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিয়োজিত যেকোনো সরকারের জন্য উল্লিখিত তিনটি চীনা পদক্ষেপ থেকে শিক্ষা নেয়ার আছে। আমাদের সরকারকে সেসব গ্রহণের পরামর্শের পাশাপাশি তৃতীয় বিষয়টিতে আরো কিছু যোগ করব। ঐতিহাসিকভাবে চীনা নেতৃত্ব উন্নয়ন পথের উভয় বাম ও ডান বিচ্যুতি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক (অবিচ্ছেদ্য) ধাপ হিসেবে গণ্য করেছে এবং পরবর্তীকালের অগ্রগতি সংহত করার জন্য প্রতিটি সংকটকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়েছে। উহানে রোগ প্রতিরোধকালে ৫জি-নির্ভর বহু ধরনের গ্যাজেটের (ইন্টারনেট অব থিংগস) ব্যাপকতর ব্যবহার আমরা লক্ষ করেছি। সেই সঙ্গে অনলাইন শিক্ষার বিস্তার এবং শহর অবরোধ (কর্ডন) ও চলাচল ব্যবস্থাপনায় জনগোষ্ঠীকে অভ্যস্ত করা কোনোভাবেই একটি 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব'-এর চেয়ে কম নয়। সমগ্র প্রক্রিয়া দেখে মনে হয় যেন চীনা জনগণকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব-উত্তর সমাজের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে ইতালিতে জীবাণু সংক্রমণের গতি ও ব্যাপ্তি মনে হোঁচট জাগায়। দেশটির অক্ষাংশ, বয়স্ক জনগোষ্ঠীর উচ্চতর অনুপাত, ধর্মীয় সমাবেশের সংস্কৃতি এবং ট্যুরিস্টদের আধিক্য দেশটিতে প্রাণঘাতী জীবাণুর বিস্তারের কারণ হিসেবে অনেকেই উল্লেখ করেন। তবে ষড়যন্ত্রের গন্ধ যারা খোঁজেন, তারা বাড়তি কিছু প্রশ্ন করেন। ইউরোপের মাটিতে ৫জি-নির্ভর আইওটির এবং অন্যান্য প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরি করতে ইতালির বর্তমান সংকট কি সুযোগে রূপান্তর করা হবে? অর্থাৎ বর্তমান সংকট কাটিয়ে ওঠার পর সেখানকার সমাজ ও অর্থনীতি কি অধিকতর প্রযুক্তিনির্ভর হবে? একইসঙ্গে অনেকেই শঙ্কিত যে, কোয়ারান্টাইন এবং শহর ও জনগোষ্ঠী অবরুদ্ধ রাখার সংক্রমণবিরোধী প্রচেষ্টা, 'অনাকাঙ্ক্ষিত' গোষ্ঠীকে চিহ্নিত ও বিচ্ছিন্ন করার জন্য অপব্যবহার হবে কিনা? দুর্ভাগ্যক্রমে ইতালির প্রতিরোধবিষয়ক উদ্যোগ সম্পর্কে গণমাধ্যমে খুব কমই জানা যায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য থেকে যে চিত্র পাই, তা মানব অগ্রগতির সব স্বপ্ন চুরমার করে দেয়। অবশ্য সংক্রমিত লোকজনের চিকিৎসা জোগাতে একটি চীনা মেডিকেল টিমের ইতালির মাটিতে পৌঁছানো এবং নিজেদের জীবন বাজি রেখে বাংলাদেশী স্বেচ্ছাসেবকদের ইতালির নাগরিকদের সহায়তায় কাজ করার কথা শোনা সত্যিই মনে নতুন আশার সঞ্চার ঘটায়।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার বাকযুদ্ধ বিশ্বপরিসরে বিনোদনের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পারস্পরিক দোষারোপের খেলা সম্প্রতি নতুন ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছেছে, যখন উহানে মার্কিন সামরিক কর্মকর্তাদের সফর এবং ওই শহরে কভিড-১৯ বিস্তারের মধ্যে সম্ভাব্য সংযোগের ইঙ্গিত চীনাদের পক্ষ থেকে এসেছে। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে বিমান যোগাযোগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যা যথেষ্ট তাত্পর্য বহন করে। এটি সম্ভব যে ইউরোপীয় পোর্টগুলোয় সীমিত লজিস্টিকস থাকায় এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত নিতে যুক্তরাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে। অথবা যুক্তরাষ্ট্রমুখী যাত্রীদের ভিনদেশের বন্দরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংক্রমণ যাচাইয়ের পুরনো ব্যবস্থা আজকের পরিস্থিতিতে অন্য দেশের পক্ষে মেনে নেয়া দুরূহ! সংশয়বাদীরা প্রথমে মনে করেছিল, ব্রেক্সিট-পরবর্তী ট্রান্স আটলান্টিক অঞ্চলের সরবরাহ চেইন (নিগড়ে) শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে প্রথমে নিষেধাজ্ঞা থেকে যুক্তরাজ্যকে বাদ রাখা হয়েছিল, সংক্রমণের তীব্রতার কারণে যা থেকে পরবর্তী সময়ে পিছিয়ে আসতে হয়। তবে নিজেদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায়

চীনাদের দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার আগে বৈশ্বিক সরবরাহ চেইন (নিগড়ে) স্বপক্ষে পুনর্বিন্যাস করতে যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে সম্ভবত আরো অনেক পদক্ষেপ আগামীতে দেখা যাবে। জীবাণু সংক্রমণ বন্ধ হওয়ার পরও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কৌশলগত খেলা অব্যাহত থাকবে। যেমনটি আমরা এরই মধ্যে কভিড-১৯ প্রতিষেধক ওষুধের স্বত্ব নিয়ে জার্মানি-যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধ লক্ষ করছি। তবে সার্বিকভাবে মনে হয়, মূল ভূখণ্ডের ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে চীনের বন্ধন আগামীতে বাড়বে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, কভিড-১৯ সংক্রমণসংক্রান্ত তথ্যাদি জনসমক্ষে পরিবেশনায় চীনাসূত্রের যতখানি উদারতা লক্ষ করা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে বা উপমহাদেশে তার সহযোগী দেশগুলোর মাঝে তার বিপরীতটিই লক্ষণীয়। হয়তো স্বাস্থ্য খাতের বিপর্যয় মোকাবেলায় চীনা সরকারি ব্যবস্থাপনা যতখানি কার্যকরী, তথাকথিত গণতন্ত্রের লেবাসধারী বাজারের ক্ষমতাধরদের স্বার্থরক্ষাকারী শাসন ব্যবস্থা ততখানিই অকার্যকর।

সনাতনী বিশ্ব ব্যবস্থাপনার অধীনে যারা আছেন, তারা আজও সহজ শর্তে অর্থায়নকেই সংকট উত্তরণের পথ হিসেবে গণ্য করেন। সেই সূত্র ধরে, উন্নয়নশীল বিশ্ব বা বলা উচিত, নিম্নমধ্যম আয়ের দেশগুলো করোনাভাইরাসের অধীনে সম্ভবত সহায়তা বা ঋণ পেতে পারে। ইউএস এইড ২৫টি দেশের জন্য ৩৭ মিলিয়ন ডলার সহায়তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশের জন্য ২ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার। টেস্টিং ল্যাব স্থাপন এবং করোনাভাইরাস রুখতে অন্য চিকিৎসা সরঞ্জামের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ অর্থায়ন। সম্ভবত একই সূত্র ধরে, সার্কভুক্ত দেশগুলোর সদ্যসমাপ্ত ইন্টারনেট সম্মেলনে অর্থ তহবিল (ফান্ড) গঠনই ছিল ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য প্রস্তাবনা। এসবের চেয়ে যোগ্য প্রতিনিধিদের নিয়ে তথ্যবিনিময় ও যৌথভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পরিচালনার উদ্যোগ দেখলে আশান্বিত হতাম।

এসব যখন ঘটছে, তখন প্রতিবেশীদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই ভারত ‘স্বেচ্ছা-আইসোলেশনের’ সিদ্ধান্ত নেয়, যা অনেককে অবাক করেছে। দেশটির উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য সরকারগুলোর নোটিস শুনলে আমাদের উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে। নিকটবর্তী ত্রিপুরার ঘটনা উল্লেখ করা যায়। তথ্য দমনের পাশাপাশি, সেখানে কভিড-সংক্রমিত দাবি করে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সমাজবিচ্ছিন্ন বা দেশান্তরের চেষ্টা আজ লক্ষ করা যায়। যখন সীমান্ত পেড়িয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত হওয়া জরুরি, সে সময় তথাকথিত ‘বাংলাদেশ থেকে আগত অভিবাসী’দের বিরুদ্ধে অযথা হয়রানি বন্ধুত্বের পরিচয় দেয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে, নিষ্ক্রিয়তার আবর্তে পড়ে রাজনীতি মনে হয় বাস্তব জগতের পেছনে পড়ে গেছে এবং কভিডে মৃত্যু যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, সেসময় নাগরিকত্ব ইস্যু ঘিরে বাচালতা নিতান্তই অর্বাচীনতার লক্ষণ নাকি হীনস্বার্থে সংকটকালীন সময়ের অপব্যবহার?

সংকট পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সমাজে অগ্রগতি আনার সক্রিয় উদ্যোগ বাংলাদেশে এখনো দৃশ্যমান নয়। বরং এ জাতীয় জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় চরম দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। আসন্ন সংকটের ভয়াবহতা স্বীকারে সরকারের বেশ সময় লেগেছে। দীর্ঘ পরিকল্পিত বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের কারণে জনসমক্ষে তথ্য সরবরাহে বিলম্ব হয়তো বোধগম্য এবং জনসাধারণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তবে ‘আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি, উচ্চপর্যায়ে ভাবছি এবং সময়মতো সিদ্ধান্ত নেয়া হবে’—এ জাতীয় ভাবসুলভ বক্তব্য অনিশ্চয়তার মুখোমুখি নাগরিকদের মনে অনাস্থা জাগাবে। স্বাস্থ্যজনিত জরুরি অবস্থায় সামাজিক ও সরকারি সেবা প্রদানে বিশেষায়িত জ্ঞানের কর্মী বাহিনীকে সম্মুখ সারিতে স্থান দেয়া প্রয়োজন। কেবল বক্তৃতা বা দলীয় কর্মী জড়ো করতে পারদর্শী দলীয় নেতাকর্মীদের দিয়ে

এটি মোকাবেলার ধারণা নিতান্তই শিশুসুলভ। উহানের অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন নিবন্ধ ও ভিডিও দেখে জানা যায়, সমাজে গুণগত পরিবর্তন আনতে রাষ্ট্র সমর্থিত (অনেক ক্ষেত্রে কমিউনিটিভিত্তিক) উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুই মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সংক্রমণের হার নিয়ন্ত্রণে এনে তাদের অভিজ্ঞতার সারসংক্ষেপ কয়েকজন কর্মী নিম্নরূপ ব্যক্ত করেন: (১) সব ধরনের সম্পদ জড়ো করা, শুধু ডাক্তার নয়, সমাজকর্মী, নির্মাণ কর্মী, প্যাথলজিস্ট, দেশে-বিদেশে অবস্থিত বিজ্ঞানী, সবাইকেই প্রয়োজন। (২) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জীবাণুর বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ জরুরি ছিল এবং বিশ্ব পর্যায়ে জ্ঞানবিনিময় উন্মুক্ত থাকায় তারা সে কাজটি দ্রুত করতে পেরেছে। এটাও জানা যায়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে মতবিনিময়ে অক্সিজেন থেরাপির কার্যকারিতা উপলব্ধি সম্ভব হয়েছে। (৩) তথ্য সরবরাহে স্বচ্ছতা জনমনে আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়েছে। ফলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অনেক কাজই সহজ হয়েছে।

বাংলাদেশে তৃতীয়টির অভাব নিদারুণ, যা খানেকাংশে অযোগ্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে কর্মসিদ্ধান্ত নেয়ার কর্তৃত্ব থাকার কারণে। এসব দৈন্যের মাঝেই আশা করব, সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং নীতিনির্ধারকরা বর্তমান সংকট কাজে লাগিয়ে বৃহত্তর সমাজকে সম্পৃক্ত করে আমাদের স্বাস্থ্যচর্চায় আমূল পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হবেন। দেশে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত গবেষণায় একটি স্বনির্ভর-সার্বভৌম পরিসর প্রতিষ্ঠা জরুরি। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সযোগিতায় অংশ নেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু অন্ধভাবে নিরীক্ষণ (মনিটরিং) ও যান্ত্রিকভাবে চিকিৎসা সেবার প্রটোকল অনুসরণ না করে স্থানীয় বাস্তবতার আলোকে প্রটোকলগুলো পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো শিক্ষা। সংক্রমণ রোধে সামাজিক প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সংকুচিত করা আবশ্যিক এবং দেরিতে হলেও স্কুল-কলেজ বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্ত এসেছে। একদিকে যেমন আশা করব গরমের আগমনে সংক্রমণ-সম্ভাবনা দূরীভূত হবে, তেমনি অনিশ্চিতকালের জন্য স্কুল বন্ধের সম্ভাবনা নাকচ করা উচিত নয়। সেই জাতীয় পরিবেশে স্কুলভিত্তিক প্রচেষ্টাকে সহযোগিতার জন্য অনলাইন শিক্ষা সুবিধা জোরদার করা প্রয়োজন। যেখানে উপযুক্ত উপরিকাঠামো নেই, সেসব জায়গায় গুচ্ছভিত্তিক শিক্ষা বা মোবাইলভিত্তিক উদ্ভাবনী ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুযোগ সৃষ্টির সহায়ক পরিবেশ গড়া সবার দায়িত্ব। সরকারি সেবা প্রদানেও গুণগত পরিবর্তন আনা জরুরি। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে সংকট পরিস্থিতিতে ডিজিটাইজেশনের প্রতিবন্ধকতা দূর করে সরকারি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ব্যাপকভাবে আনা সম্ভব।

অনেক পরিবর্তন জনগোষ্ঠী ও ব্যবসায়িক সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে এবং আইটি সমর্থিত সেবা খাতকে পৃষ্ঠপোষকতা জুগিয়ে ভালোভাবে সামলানো যেতে পারে। উদ্ভাবনে বিপুলসংখ্যক তরুণকে উদ্‌বুদ্ধ করতে হবে, যেসব উদ্ভাবন হবে স্থানীয়ভাবে শিকড় বিস্তৃত এবং সেগুলো সামষ্টিক কল্যাণের জন্য তরুণদের আরো যথোপযুক্ত পথের দিশা দেবে। তবে সেগুলো উপলব্ধি করতে হলে সরকারকে দলকেন্দ্রিক সামাজিক সম্পৃক্ততা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। হায়েনাদের মতো অনেক স্বার্থান্বেষী সুযোগসন্ধানী এ সংকটকালে হাজির হবে, যাদের কাছ থেকে জনস্বার্থ সুরক্ষা জরুরি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সংকট দ্বারা নতুন পরিসর সৃষ্টি হচ্ছে এবং সেসব ক্ষেত্র শিকড়বিহীন লোভী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি না করে স্থানীয়ভাবে গভীর শিকড়বদ্ধ এজেন্সির কর্মপরিসর প্রসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথায় সংকট মোকাবেলায় এবং সংকটকে সুযোগে রূপান্তরিত করতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেবে।

(একই বিষয়বস্তু নিয়ে দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় লেখকের একটি নিবন্ধ ১৬ মার্চ প্রকাশিত হয়েছে। এ নিবন্ধে উপস্থাপিত বক্তব্য লেখকের নিজস্ব, যার সঙ্গে ইআরজির কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই।)

ড. সাজ্জাদ জহির: অর্থনীতিবিদ; নির্বাহী পরিচালক, ইকোনমিক রিসার্চ গ্রুপ